ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১, চৈত্র ১৪০৭

তত্ত্বধায়ক সরকার ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

রাকিবা ইয়াসমিন *

Care-Taker Government : Bangladesh Perspective

- Rakiba Yeasmin

Abstract : The main objective of the liberation movement was to establish a well-balanced system of democratic government in Bangladesh. To achieve this objective the mass participated the straggle for freedom several times and sacrificed a lot. The prerequisites for the restoration of democracy are to ensure the right of voting-power through fair and impartial election and to establish a responsible parliamentary type of government. But as the democracy in our country is still in its developing form so it needs a constitutional arrangement for the well-running of democracy. The 6th national parliament of Bangladesh passed the 13th amendment Bill of the constitution on March 28th, 1996 which is mostly known as the Care-Taker Government Bill.

It is Pertinently to mention that a non party impartial Care-Taker Government was formed on December 6,1990 to conduct a free and fair election. The fifth parliament election was held under this Government on the 27th February, 1991. Later on by the 13th Amendment Bill of the Constitution a new example was set up in the democratic system of government and an unprecedented idea was added to it.

This paper aims to include discussion on the necessity of Care-taker government in the context of Bangladesh. The 13th Amendment Bill of the constitution, the question of referendum as to give the 13th Amendment Bill a constitutional validity, the reaction of the politicians to it, a comparative study of the two preceding care-taker governments and the future applicability of the said government for the interest of the country have been discussed in this article.

ভূমিকা

বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে ও সংবিধানে "তত্ত্বাবধায়ক সরকার" ধারনাটি বিভিন্নভাবে এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়। সামরিক শাসক এরশাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন শেষে ১৯৯০ এর ৬ ডিসেম্বর সব রাজনৈতিক দল সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের উদ্দেশ্য হ'ল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান। ১৯৯১ এর ২৭ ফেব্রুয়ারী সফলভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে সংসদ নির্বাচন পরিচালিত হওয়ায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সর্বজনগ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। ফলে বর্তমানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসু করার জন্য তত্ত্ববধায়ক সরকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কিন্তু একটা নতুন ধারণা হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে বিপক্ষে রয়েছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। কিন্তু অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার উত্তম সরকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশে অতি অল্প সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি সাংবিধানিক রূপ লাভে সমর্থ হয়েছে।

উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তাত্ত্বিক দিকসহ বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর সফলতা ও ব্যর্থতা, সাংবিধানিক আইনের বিভিন্ন দিক ও রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ফলপ্রসু করার বিভিন্ন দিক আলোচনার প্রয়াস রয়েছে।

পদ্ধতি

গবেষণা কর্মে অনুসৃত প্রধান পদ্ধতিগুলো হচ্ছে

প্রথমতঃ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন লেখকের লেখা, জার্নাল, বই পত্র, সমীক্ষা ও অন্যান্য প্রকাশনাকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ বিশেষত: ১৯৯০ এর ডিসেম্বর থেকে '৯১ মার্চ এবং '৯৬ এর জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো এবং এ সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও বই থেকে সংগৃহিত তথ্যগুলোকে গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তাত্ত্বিক ও ধারণাগত কাঠামো ঃ নির্বাচনকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি ক্রমবর্ধিষ্ণু মতবাদ বলা যায়। নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং এমনকি

এ উপমহাদেশে ও দূর অতীত কাল থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আকাংখা প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে ও সংবিধানে "তত্ত্বাবধায়ক সরকার" ধারনাটিকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার শব্দটিকে নিম্নোক্ত তিনটি অর্থে ব্যবহার করা যায় ঃ

(ক) অনুমিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার

(খ) বিশেষ অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং

(গ) প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

ক. অনুমিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার

আস্থা ভোটে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীর পতন বা মেয়াদ শেষে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার পর অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য ক্ষমতাসীন সরকারই অন্তবর্তীকালীন সরকারে রূপান্তরিত হয়। নির্বাচন পূর্ববর্তীকালীন সময়ে ক্ষমতাসীন সরকারের এরূপ রূপান্তরকে অনেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে থাকেন। (A. K. Brohi, 1958 : 116)

এরূপ রূপান্তর পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক দেশেই স্বীকৃত। বৃটেন, ফ্রান্স, কানাডা, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় থাকা অবস্থাতেই নির্বাচন হয়; নির্বাচনের পূর্বে তাকে পদত্যাগ করতে হয় না। পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে "তত্ত্বাবধায়ক সরকারে পরিণত করার বিধান ছিল। (তারেক শামসুর রহমান (সম্পা.), ১৪৩)। কিন্তু এরূপ রূপান্তরিত অন্তবর্তীকালীন সরকারকে প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা যায় না। কারণ ক্ষমতায় থেকেই এ সরকার নির্বাচনে অংশ নেয় এবং ফলে তত্ত্বাবধায়নের প্রকৃত কাজটি তার দ্বারা সম্ভবপর হয় না।

খ. বিশেষ অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে বা সাংবিধানিক বিধানের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ঠভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান রাখা হয়। উদাহরণ স্বরূপ সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি ইংল্যান্ডে সম্ভবত প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় তৎকালীন পদত্যাগী প্রধান মন্ত্রী উইনস্টন স্পেন্সসার চার্চিলের নেতৃত্বে, ১৯৪৫ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন-এর স্থলে চার্চিলকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। উদ্দেশ্য, যে-কোন মূল্যে নাৎসি

জার্মানির বিরুদ্ধে জয়লাভ, এরা দু'জনই ছিলেন রক্ষণশীল দলের নেতা। চলমান যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ইংল্যান্ডের তিনটি প্রধান দলই নির্বাচনের বদলে একটি কোয়ালিশন সরকার চাচ্ছিল। চার্চিল সর্বদলীয় একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছিলেন। এজন্য এ সরকারটি একটি জাতীয় সরকার হিসেবেও গণ্য। চার্চিলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড ও মিত্র শক্তি যুদ্ধে ব্যাপকভাবে জয়ী হয়। যুদ্ধ জয়ের পর চার্চিল তার বিজয়ের সুনাম কাজে লাগিয়ে পরবর্তী নির্বাচনের সুবিধা নিতে পারেন এমন কথা আলোচিত হতে থাকে। এ অবস্থায় চার্চিল সর্বদলীয় জাতীয় সরকারের প্রধান হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেন ১৯৪৫ সালের ২৩মে। সাথে সাথেই রাজা তাকে একটি নতুন সরকার গঠনের আহ্বান জানান। (মিজানুর রহামন খান, ১৯৯৫ ঃ ১৩) Sir Ivor Jennings উইনষ্টন চার্চিলের নেতৃত্বে গঠিত এ মন্ত্রীসভাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে অভিহিত করেছেন। চার্চিলের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৪৫ সালের ৫ জুলাই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন চার্চিলের রক্ষণশীল দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং ক্লিমেন্ট রিচার্ড অষ্টলির নেতৃত্বে শ্রমিকদল ব্যাপক বিজয় লাভ করে ও সরকার গঠন করে। এ অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের পথ ধরেই পরবর্তীতে বৃটেনে কনভেনশন গড়ে উঠে যে, নির্বাচন পূর্ববর্তী একটি অন্তবর্তীকালীন সময়ে ক্ষমতাসীন সরকার আপনা-আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারে রূপান্তর লাভ করে। আবার পাকিস্তানের সংবিধানের ৪৮(৫) অনুচ্ছেদে রয়েছে বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রিসভা গঠনের বিধান। এখানে তত্ত্বাবধায়ক ক্যাবিনেট গঠন সম্পর্কে কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি। নির্দলীয় নিরপেক্ষ লোক নিয়োগের কোন বাধ্যবাধকতা নেই; যারা তত্ত্বাবধায়ক ক্যাবিনেটে থাকবেন তাদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এ বিধান অনুসারে ১৯৮৮ সালে জেনারেল জিয়াউল হক নিহত হওয়ার পর পাকিস্তানে প্রথমবারের মত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে দুর্বল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে বেনজির ভুট্রো সরকার গঠন করেন। এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান বেনজিরকে বরখাস্ত করেন এবং নতুন নির্বাচনের তফসীল ঘোষণা করেন। বেনজির সুপ্রীম কোর্টে গমন করেন। যেমনটা গিয়েছিলেন জুনেজো। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট এ উভয় ক্ষেত্রেই প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তকে সমুন্নত রাখেন। দ্বিতীয়বার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯০ সালের অক্টোবরে নির্বাচন হয়। উক্ত নির্বাচনেও কেয়ারটেকার সরকারের মন্ত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ আনা হয়। (মিজানুর রহমান খান, ১৯৯৫

ঃ ১৩)। সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে বলা থাকলেও পাকিস্তানের এ দু'টি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রকৃত অর্থে তত্বাবধায়ক সরকারের পর্যায়ে পড়ে না, কারণ এ দু' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মন্ত্রীরা নির্বাচনে অংশগ্রহন করে এবং ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ আনা হয়।

গ. প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে নির্বাচনকে প্রভাবমুক্ত অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করার জন্য অন্তবর্তীকালীন এমন একটি সরকারকে বুঝায়- যা সম্পূর্ণভাবে নির্দলীয় এবং নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ থেকে ঐ সরকারের প্রত্যেক সদস্য বিরত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে বিধান সংযোজন করা হয়েছ এতে প্রকৃত অর্থে তত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনে সেনাবাহিনীর ফর্মূলা অনুসারে, ক্ষমতার মঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ান নওয়াজ ও ইসহাক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে আসেন মঈন কোরেশী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মন্ত্রীরা এবার আর নির্বাচনের প্রার্থী হননি কেউ। ১৯৯৩ এর নির্বাচনকে সামনে রেখে পাকিস্তানে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারটি গঠিত হয় তা'ছিল প্রকৃত অর্থেই একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার। (মিজানুর রহমান খান, ১৯৯৫ ঃ ১৫) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের অন্তবর্তীকালীন সরকারটি সাংবিধানিক ও আইনগত দৃষ্টিকোন থেকে কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল না, কারণ সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন ধারণা ছিল না। সাহাবুদ্দীন আহমেদ উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করার পর তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে রাজনৈতিক এবং দর্শনগত দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে সাহাবুদ্দীন আহ্মদের সরকারটি ছিল প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কারণ তার সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের কেউ নির্বাচনে অংশ নেয়নি। সম্পূর্ণ নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এ সরকার একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন উপহার দিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভিত্তি, গঠনের কারণ, প্রক্রিয়া ও কার্যাবলী নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও বিশ্বের প্রায় সবদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি নবীন ও উন্নয়শীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশেও অবাধ ও সুষ্ঠু

নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটা সাংবিধানিক রূপ লাভে সমর্থ হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জুরিসডিকশন

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জুরিসডিকশন তথা ক্ষমতার পরিধি কতটুকু হবে, এ নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। সাংবিধানিকভাবে পাকিস্তানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান থাকলেও এ সরকারের কর্ম পরিধির কোন সীমাবদ্ধতার নির্দেশ নেই। তাই সেখানে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচিত সরকারের মতই কার্যক্রম চালাতে পারে। ভারতীয় ইতিহাসে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য কলকাতা হাইকোর্ট এক রায়ে কেবলমাত্র দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার শর্ত আরোপ করে। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Sir Ivor Jennirgs সর্বপ্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আলোচনা করলেও তিনি এ সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেননি বা এ সরকারের দৈনন্দিন প্রশাসন বা নীতিগত বিষয়াদি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। ১৯৭৯ সালের ১০ অক্টোবর ভারতে মাদ্রাজ হাইকোর্টের ৭ সদস্যের ফুল বেঞ্চ চৌধুরী চরণ সিং এর সরকার সংক্রান্ত ২টি রিট মামলার রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। মামলার রায়ে (১০ অক্টোবর, ১৯৭৯) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি সংজ্ঞা প্রদান করা হয়– "Though the constitution itself does not refer to a 'care-taker government' is get it is possible to understand the expression' care-taker government' as the government in power after dissolution of the 'loksabha' and before its reconstitution" (তারেক শামসুর রহমান ঃ ১৪৪)। বাংলাদেশে ১৯৯০ এর গণআন্দোলন শেষে প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা সম্পর্কে ১৫, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের অভিন্ন চারদফা ঘোষণার দ্বিতীয় দফায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা ও কর্মপরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন না অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি বা সংসদ সদস্যপদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। তার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন উপদেষ্টা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। অন্তবর্তীকালীন এ সরকার শুধুমাত্র প্রশাসনের দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করবেন। অর্থাৎ এ সরকারের মূল দায়িত্বই হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম জাতীয়

সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। (বিপুল রঞ্জন নাথ ঃ ৪০০)

উল্লেখ্য, ১৯৯০ এর ৬ ডিসেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা হলেও সাংবিধানিক দিক থেকে ঐ সরকার তত্ত্বাবধায় সরকার ছিল না। সংবিধানের একাদশ সংশোধনীতেও বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের সরকারকে নির্দলীয় সরকার বলা হয়ছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা হয়নি (মিজানুর রহমান খান, ১৬৫)। তবে রাজনৈতিক এবং দর্শনগত দৃষ্টিকোন থেকে এ সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। মূলতঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে প্রায় সবদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এক কথায় আমরা বলতে পারি সাধারণ সরকারের কর্মপরিধি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মপরিধি থেকে ব্যাপক। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এ সরকারকে দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা করা ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থেই কেবলমাত্র কিছু নীতি নির্ধারনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্রমবিকাশ

১৯৯১ সালে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি ছিল নিরপেক্ষ নির্বাচন। এ নির্বাচন প্রমাণ করে যে, সরকার নিরপেক্ষ ও আন্তরিক হলে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। আর সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপর। নিম্নে ১৯৯১ সালে ও ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পটভূমি আলোচনা করা হলোঃ

প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পটভূমি

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের এক সংকটময় পরিস্থিতিতে গঠিত হয়। বাংলাদেশে পর পর দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারই গঠিত হয়েছে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো ও দেশের আপামর জনগণের দীর্ঘ আন্দোলন, হরতাল, নিষেধাজ্ঞা, হত্যা ও দেশের কোটি কোটি টাকা অপচয়ের মাধ্যমে। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ একটি নির্বাচিত বৈধ সরকারকে সরিয়ে শক্তির বলে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করে। এরশাদ তার ৮ বছর ৯মাস শাসনামলে একটি গণভোট, একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও ২ বার সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। কিন্তু

এরশাদের আমলে কোন নির্বাচনই অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই ১৯৮৮ সালে নির্বাচনের পর প্রধান বিরোধী দলগুলো এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের শেষের দিকে এ আন্দোলন তীব্রতর হয়। বিভিন্ন পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবি সংগঠনও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ব্যাপকভাবে যোগদান করে। বিরোধী দলগুলোর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট আন্দোলনের লক্ষ্য ও ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা সম্পর্কে ১৯৯০ এর ১৯ নভেম্বর ঘোষনা দেয়। এ ঘোষনায় বলা হয়–

ক. ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট এরশাদ এর অধীনে কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না। এরা কেবল একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে "সার্বভৌম সংসদ" নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।

খ. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে এরশাদকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে। এরশাদ পদত্যাগের পূর্বে তিনজোটের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তিকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করবেন এবং এ নতুন উপ-রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

গ. উপ-রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিন মাসের মধ্যে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে।

ঘ. তত্ত্বাবধায়ক সরকার সার্বভৌম সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এবং সংসদের কাছে সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আপামর জনগণের সমর্থন ও প্রবল গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতাসীন জেনারেল এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর তৎকালীন বিরোধী দল ও জোট সমূহের প্রস্তাবিত "নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক" সরকারের জন্য ঘোষিত রূপরেখা প্রণয়ন করার ঘোষণা দেন। ৬ ডিসেম্বর বিরোধী রাজনীতিকদের নির্দেশমত (তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদের পদত্যাগ, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দান এবং অতঃপর জেনালের এরশাদ নিজে পদত্যাগ করে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শাহাবুদ্দিন আহমেদকে দায়িত্বগ্রহণের সুযোগ দান) জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন।

গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকারের পতনের পর তিন জোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

হিসেবে মনোনীত করে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ফলে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ হন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর শাহাবুদ্দিন আহমেদ সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা ঘোষনা করেন এবং সে ব্যাপারে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। এরপর তিনি মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ১৭জন প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং নির্দলীয় ব্যক্তিত্ব সমন্বয়ে এক উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। নিম্নে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের নাম দেয়া হল ঃ

ক্রঃ নং	নাম	মন্ত্রণালয়
০১।	অধ্যাপক জিল্লুর রহামন সিদ্দিকী	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
০২।	অধ্যাপক ওয়াহিদুদ্দিন আহমদ	জ্বালানী, খনিজ পদার্থ ও পূর্তকর্ম
০৩।	অধ্যাপক রেহমান সোবহান	পরিকল্পনা
০৪।	অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন আহমদ	সংস্কৃতি ও খাদ্য
০৫।	অধ্যাপক ডাঃ এম. এ. মাজেদ	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
০৬।	বিচারপতি এম. এ. খালেক	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক
০৭।	জনাব কফিল উদ্দীন মাহমুদ	অর্থ
০৮।	জনাব ফখরুদ্দিন আহমদ	পররাষ্ট্র
০৯।	জনাব আলমগীর এম. এ. কবীর	সমাজ কল্যাণ,মহিলা বিষয়ক এবং যুব উন্নয়ন ও ক্রীড়া
১০।	জনাব এ. কে. এম. মুসা	শিল্প মন্ত্রণালয়
১১।	জনাব ফজলুর রহমান	সেঁচ, পরিবেশ, বন, মৎস ও পশু সম্পদ
১২।	মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম	জাহাজ, নৌ চলাচল এবং পর্যটন
১৩।	জনাব এ. বি. এম. জি. কিবরিয়া	যোগাযোগ এবং টেলিযোগাযোগ
১৪।	জনাব ইমাম উদ্দিন আহমদ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১৫।	জনাব বি. কে. দাস	ত্রাণ ও পূনর্বাসন
১৬।	জনাব এম. আনিসুজ্জামান	কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা
১৭।	জনাব চৌধুরী এম. এ. আমিনুল হক	শ্রম, জনশক্তি এবং আভ্যন্তরীন সম্পদ

(মোজাম্মেল হক ঃ ৩৫৮)

সংক্ষিপ্ত হলেও রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের শাসনকাল ঘটনাবহুল, গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক। ৮, ৭ ও ৫ দলের পছন্দসই অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিন জোটের অনুরোধে এবং স্বপদে পুনরায় ফিরে যেতে পারবেন এ শর্তে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ তাঁর কার্যকাল দুভাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংবিধান অনুযায়ী তিনি ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান। কেননা তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইন কার্যকর হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সাল থেকে। এর ফলে ১৯৯১ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। শাহাবুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসন আমলে দ্বাদশ সংশোধনটি সংবিধানে যুক্ত হয়। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধানে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদের এ নির্বাচন ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর হতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোট পদের মনোনয়নপত্র জমা দেবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সে সাথে তারা নির্বাচনী কাজের সাথে সাথে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১১/০১/৯১)। নিম্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর সংখ্যা ও প্রতীকের নাম উল্লেখ করা হ'ল ঃ

ক্রমিক	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রতিক
০১।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	নৌকা
০২।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০০	ধানের শীষ
০৩।	জাতীয় পার্টি	২৭২	লাঙল
০৪।	জামায়াতে ইসলামী	২৭২	দাঁড়িপাল্লা
০৫।	জাকের পার্টি	২৫১	গোলাপ ফুল
০৬।	জাসদ (রব)	১৬১	পদ্মফুল
০৭।	জাসদ (ইনু)	৬৮	মশাল
০৮।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৬২	হ্যারিকেন
০৯।	বাংলাদেশ ফ্রীডম পার্টি	৬৫	কুড়াল
১০।	বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট	৫৮	মিনার

ক্রমিক	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রতিক
১১।	জনতা দল	৫০	জাহাজ
১২।	খেলাফত আন্দোলন	৪৩	বটগাছ
১৩।	জাসদ (সিরাজ)	৩১	হাতপাখা
১৪।	ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	হাতুড়ি
১৫।	কমিউনিস্ট পার্টি	৪৯	তারা
১৬।	বাকশাল	৬৮	কাস্তে
১৭।	ন্যাপ (মোজাফফর)	৩১	কুঁড়েঘর
১৮।	ন্যাপ (ভাসানী)	৩০	লাঠি
১৯।	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	১৬	গাভী
২০।	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২০	বাঘ
২১।	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	১৩	তালা
২২।	গণতান্ত্রিক পার্টি	০৯	কবুতর
২৩।	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট লীগ	২৬	চাবি
২৪।	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১৫	নলকুপ
২৫।	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১৩	মোমবাতি
২৬।	গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	১১	মই
২৭।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	১০	ঘোড়া
২৮।	জাতীয় বিপ্লবী পার্টি	০৯	ঘুড়ি
২৯।	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	০৭	চাঁদ
৩০।	জাতীয় যুক্তফ্রন্ট	০৭	দোয়াত-কলম
৩১।	জাতীয় জনতা পার্টি	০৭	হরিণ
৩২।	জাতীয় তাঁতী দল	০৭	চরকা
৩৩।	বাংলাদেশ হিন্দুলীগ	০৬	শঙ্ক
৩৪।	বাংলাদেশ গণপরিষদ	০৬	নোঙ্গর
৩৫।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল	০১	উট
৩৬।	মুসলীম লীগ (ইউসুফ)	০৮	হ্যারিকেন
৩৭।	মুসলীম লীগ (মতিন)	০৬	হ্যারিকেন
৩৮।	মুসলিম লীগ (আইনুদ্দিন)	০৬	হ্যারিকেন
৩৯।	বাসদ (মাহবুব)	০৬	রিক্‌শা
৪০।	অন্যান্য রাজনৈতিক দল	৪৯	
৪১।	স্বতন্ত্র	৪২৪	

(উৎস ঃ বাংলাদেশ অবজারভার, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১)

উপরোক্ত সারণী পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অসংখ্য রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে এক দিকে যেমন পুরুষ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি মহিলা প্রার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট ৩৭জন মহিলা সদস্যা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

নির্বাচনী ফলাফল

১৯৯১ সালের নির্বাচনের সমগ্র ফলাফল ঘোষিত হলে দেখা যায় যে, বি এন পি ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৪১টি আসন অপরদিকে আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসন লাভ করে এবং জোট গ্রুপ পায় ১১টি আসন, জাতীয় পার্টি লাভ করে ৩৬টি আসন এবং জামায়াতে ইসলামী পায় ১৮টি আসন। ভোটের হার অনুপাতে বিএনপি ৩১%, আওয়ামী লীগ ২৮%, ও জাতীয় পার্টি পায় ১২%। (বাংলাদেশ টাইমস, ২ মার্চ, ১৯৯১)। এ নির্বাচনে একটি দিক স্পষ্ট যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সর্বমোট ৭৫টি রাজনৈতিক দল এর মধ্যে ৬৪টি দলের সদস্য কোন আসনেই জয়ী হতে পারেনি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জাতীয় সংসদের ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য পরোক্ষ নির্বাচনে বি এন পি ২৮টি আসন লাভ করে এবং জামায়াতে ইসলামী লাভ করে ২টি আসন। ফলে বি এন পি'র সর্বমোট আসন সংখ্যা হয়-১৬৯টি এবং জামায়াতে ইসলামী দলের হয় ২০টি। ১৯৯১ এর নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন চিত্র নিম্নে সারণীর মাধ্যমে দেখানো হ'ল ঃ

ক্রমিক নং	দলের নাম	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
০১।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১৪১+২৮টি
০২।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৮৮টি
০৩।	জাতীয় পার্টি	৩৫টি
০৪।	জামায়াতে ইসলামী	১৮+২টি
০৫।	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (সিপিবি)	০৫টি
০৬।	বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ	০৪টি
০৭।	ইসলামী ঐক্যজোট	০১টি
০৮।	ওয়ার্কাস পার্টি	০১টি
০৯।	জাসদ (সিরাজ)	০১টি
১০।	ন্যপ (মোজাফফর)	০১টি
১১।	গণতন্ত্রী পার্টি	০১টি
১২।	এন ডি পি	০১টি
১৩।	স্বতন্ত্র	০৩টি

(উৎস ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ডঃ আব্দুল ওদুদ ভূইয়া, পৃ: ৫৬৩)

উপরের পরিসংখ্যানে সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ মোট ৩৩০টি আসনের বন্টন দেখানো হলো। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি এন পি সর্বাধিক আসন পাওয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ বি এন পি'কে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু বি এন পি একক সংখ্যা গরিষ্ঠ না হওয়ায় জামায়াতে ইসলামীর সহায়তায় সরকার গঠন করে এবং তারা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ এবং তার তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে অবদান রেখে গেছেন বাংলাদেশের জনগণ তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। (মোজাম্মেল হক, ১৯৯৭ ঃ পৃ: ৩৬৬)

দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পটভূমি

পঞ্চম সংসদের প্রথম থেকেই বিরোধীদলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানে সংযোজনের জন্য সরকারকে চাপ দিতে থাকে। ১৯৯৩ সালের ২৮ অক্টোবর প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে "অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক" সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সম্বলিত একটি বিল সংসদে উপস্থাপনের নোটিশ প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকেও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব সম্বলিত বিলের নোটিশ সংসদে পেশ করা হয়। সবগুলো বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, জাতীয় নির্বাচনগুলোকে অবাধ এবং নির্বাচনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবমুক্ত করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানে সংযোজন করা উচিত। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল বি এন পি এ সব বিল সংসদে উত্থাপনের ব্যাপারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি; বরং বি এন পি সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে নির্বাচন কমিশনকে অধিকতর শক্তিশালী করার মাধ্যমে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের এ যুক্তি ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত মাগুরা-২ উপ নির্বাচনের মাধ্যমে অন্তসারশূণ্য বলে প্রতীয়মান হয়। উপ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর মাগুরা জেলা ও সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্মকর্তাদের বদলি করা হয়। নির্বাচনী "Code of Conduct" অবজ্ঞা করে প্রধানমন্ত্রীসহ রেকর্ড সংখ্যক মন্ত্রী ও বি এন পি সাংসদ নির্বাচনী প্রচারনায় অংশ গ্রহণ করেন। ফলে প্রশাসনকে দলীয় কার্যে ব্যবহারসহ নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস ও কারচুপির অভিযোগ উঠে (Sayfullah Bhuyan and Arun Kumar Goswami, 1998 : 22) । মাগুরা উপ নির্বাচনের

অভিজ্ঞতা বিরোধী দলগুলোর মধ্যে এ আশংকা দৃঢ়মূল করে যে, বি এন পি দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।

১৯৯৪ সালের ২৭ জুন সংসদের প্রধান তিন বিরোধী দল (আ. লীগ, জাপ, জামায়াত) এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে গোষণা করেন যে, একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যতীত কোন দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো অংশগ্রহণ করবে না এবং এরূপরেখা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত গণআন্দোলন চলবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখায় বর্ণিত বিষয়সমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমতঃ একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

দ্বিতীয়ত ঃ অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলনরত রাজনৈতিক দল সমূহের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। এ প্রধানমন্ত্রীই সরকার প্রধান হিসেবে তার কাজ পরিচালনা করবেন।

তৃতীয়ত ঃ অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধামন্ত্রী নিজে কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না, এমন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করবেন।

চতুর্থত ঃ এ সরকারের মূল দায়িত্ব হবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।

পঞ্চমত ঃ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬নং অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তবর্তীকালীন সরকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ষষ্ঠত ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানে প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধুমাত্র জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

সপ্তমতঃ নির্বাচন কমিশনকে আরো জোরদার করার প্রস্তাবও রাখা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখায়। এ লক্ষ্যে কমিশনকে পুনর্গঠন এবং এর জন্য

অভিজ্ঞতা বিরোধী দলগুলোর মধ্যে এ আশংকা দৃঢ়মূল করে যে, বি এন পি দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।

১৯৯৪ সালের ২৭ জুন সংসদের প্রধান তিন বিরোধী দল (আ. লীগ, জাপ, জামায়াত) এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে গোষণা করেন যে, একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যতীত কোন দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো অংশগ্রহণ করবে না এবং এরূপরেখা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত গণআন্দোলন চলবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখায় বর্ণিত বিষয়সমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমতঃ একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

দ্বিতীয়ত ঃ অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলনরত রাজনৈতিক দল সমূহের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। এ প্রধানমন্ত্রীই সরকার প্রধান হিসেবে তার কাজ পরিচালনা করবেন।

তৃতীয়ত ঃ অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধামন্ত্রী নিজে কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না, এমন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করবেন।

চতুর্থত ঃ এ সরকারের মূল দায়িত্ব হবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।

পঞ্চমত ঃ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬নং অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তবর্তীকালীন সরকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ষষ্ঠত ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানে প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধুমাত্র জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

সপ্তমতঃ নির্বাচন কমিশনকে আরো জোরদার করার প্রস্তাবও রাখা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখায়। এ লক্ষ্যে কমিশনকে পুনর্গঠন এবং এর জন্য

স্বয়ংসম্পূর্ণ আচরণ বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে একে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় (ডঃ মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূইয়া ঃ ৫৯৮)।

বিরোধীদলগুলোর কোন দাবীর প্রতি সরকার কর্ণপাত না করায় সব বিরোধী দল নির্বাচন বর্জনের ঘোষনা দেয়। বিরোধী দলগুলোর প্রতিরোধের মুখে ১৫ ফেব্রুয়ারী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফলাফল বিরোধী দলগুলোকে আরও প্রতিবাদমূখর করে তোলে। এর পরে ৯ মার্চ থেকে সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলগুলো লাগাতার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। এ অসহযোগের মাঝেই ১৯ মার্চ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় এবং ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। সরকার ২১ মার্চ তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল সংসদে উত্থাপন করে এবং ২৬ মার্চ সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল (ত্রয়োদশ সংশোধনী) পাশ হয়। ৩০ মার্চ সংসদ ভেঙ্গে দিযে খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে নিয়োগ প্রদান করেন। এভাবে লাগাতার তিন সপ্তাহের অসহযোগ এবং দুই বৎসরের রাজনৈতিক সংকটের অবসান হয় (মোঃ আব্দুল হালিম ঃ ৩৬২)।

দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

১৯৯৬ সালের ৩ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এদেশের ১০জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দান করেন। নিম্নে হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন কাঠামো তুলে ধরা হল ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার

প্রধান উপদেষ্টা : জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান		
ক্রঃ নং	**উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ**	**দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়**
০১।	ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ	আইন, বিচার ও সংসদ এবং স্থানীয় সরকার
০২।	ডক্টর মোহাম্মদ ইউনসু	শিল্প মন্ত্রণালয়
০৩।	অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক	ক্রীড়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

স্বয়ংসম্পূর্ণ আচরণ বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে একে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় (ডঃ মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূইয়া ঃ ৫৯৮)।

বিরোধীদলগুলোর কোন দাবীর প্রতি সরকার কর্ণপাত না করায় সব বিরোধী দল নির্বাচন বর্জনের ঘোষনা দেয়। বিরোধী দলগুলোর প্রতিরোধের মুখে ১৫ ফেব্রুয়ারী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফলাফল বিরোধী দলগুলোকে আরও প্রতিবাদমূখর করে তোলে। এর পরে ৯ মার্চ থেকে সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলগুলো লাগাতার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। এ অসহযোগের মাঝেই ১৯ মার্চ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় এবং ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। সরকার ২১ মার্চ তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল সংসদে উত্থাপন করে এবং ২৬ মার্চ সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল (ত্রয়োদশ সংশোধনী) পাশ হয়। ৩০ মার্চ সংসদ ভেঙ্গে দিযে খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে নিয়োগ প্রদান করেন। এভাবে লাগাতার তিন সপ্তাহের অসহযোগ এবং দুই বৎসরের রাজনৈতিক সংকটের অবসান হয় (মোঃ আব্দুল হালিম ঃ ৩৬২)।

দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

১৯৯৬ সালের ৩ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এদেশের ১০জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দান করেন। নিম্নে হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন কাঠামো তুলে ধরা হল ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার

প্রধান উপদেষ্টা : জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান		
ক্রঃ নং	**উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ**	**দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়**
০১।	ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ	আইন, বিচার ও সংসদ এবং স্থানীয় সরকার
০২।	ডক্টর মোহাম্মদ ইউনসু	শিল্প মন্ত্রণালয়
০৩।	অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক	ক্রীড়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ক্রঃ নং	উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
০৪।	শেগুফতা বখ্‌ত চৌধুরী	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
০৫।	এ. জেড. এম নাছির উদ্দিন	কৃষি, খাদ্য ও ত্রাণ এবং ভূমি, মৎস ও পশু সম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
০৬।	মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুর রহমান খান	স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও ধর্ম মন্ত্রণালয়
০৭।	ডক্টর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ	অর্থ মন্ত্রণালয়
০৮।	সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী	যোগাযোগ, নৌ পরিবহন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৯।	ডক্টর নাজমা চৌধুরী	শ্রম, মহিলা ও সমাজ কল্যাণ বিষয়
১০।	ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়।

(মোজাম্মেল হক ঃ ৩৮১)

বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতার মেয়াদ ছিল ৮৫দিন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১২ জনু একটি সফল, কারচুপি বিহীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। এ নির্বাচনে সর্বমোট ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন ২৭৯জন। মহিলা প্রার্থী ছিলেন ৩৬জন। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদায় নেন ২৩জুন। এদিন নতুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শপথ নেওয়ার সাথে সাথেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ শেষ হয়। (মোজাম্মেল হক ঃ ৩৮৩)

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে জরীপ

"Development Research Partners" নামক এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী কতিপয় এলাকার এক হাজার লোকের উপর পরবর্তী সব জাতীয় সংসদের নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে প্রদত্ত মতামত জরীপের ফলাফলে দেখা গেছে যে, উত্তর দাতাদের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ লোক এ জাতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য

সংবিধানের প্রয়োজনীয় বিধিবিধান করার পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে, কেবলমাত্র শতকরা ৩০.৪ ভাগ লোক বিশ্বাস করেন যে, জনগণের নির্বাচিত যে কোন সরকারের তত্ত্বাবধায়নে অবাধ, সুষ্ঠু ও মোটামুটি সরকারী প্রভাবমুক্ত জাতীয় সংসদের সাধারণ বা সব উপ-নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব। (দৈনিক আজকের কাগজ, ১০০৪, পৃ. ৫-৬) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে তীব্র আন্দোলনের সময় (১৯৯১) পরিচালিত এ জরিপে জনগণের আকাংখা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমদিকে বি এন পি সরকার তার সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে প্রবল আন্দোলনের মুখে বিএনপি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত বিল' মেনে নিতে সম্মত হয় এবং সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাশ করে। আবার আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রচারিত অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যার সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত যে মতামত দেয়া হয়েছে এখানে সে অংশটি উদ্ধৃত করা হল-"আমি দীর্ঘদিন যাবৎ বলে আসছি কোন দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণ অবাধ, সুষ্ঠু, স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ ভোট প্রয়োগ করতে পারবে না। আমরা বার বার বলেছি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী তিন/চারটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে" (দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৯৯৬)। উদ্ধৃতির প্রথম অংশের মনোভাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশবাসীর জন্য হতাশাব্যঞ্জক। এখানে যে দিকটি উত্থাপন করা হয়েছে তা হল, কোন দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। যদি বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের এ মনোভাব গ্রহণ করা হয়, তবে সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে, কোন রাজনৈতিক দলই দূর্নীতির বাইরে নয় এবং জনগন দুর্নীতিপরায়নদের ভোট দিয়ে গণপ্রতিনিধি নির্বাচতি করেন এবং শাসনাধিকার তাদের উপর ছেড়ে দেন। রাজনৈতিক দলের রাজনীতির আদর্শ হ'য়া উচিত দেশ ও জাতি নির্ভর। যে রাজনীতি দেশবাসীর অবস্থা পরিবর্তনে অক্ষম এবং শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ হাসিলে সচেষ্ট সে রাজনীতিতে জনগনের আস্থা রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করেও বার বার অসাংবিধানিক উপায়ে সরকার পদত্যাগের আন্দোলন করে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আর এ কারণেই সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তনের দশ বছর পূর্ণ হলেও আজো আমরা তার সুফল লাভ করতে পারিনি। তাই শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ সুদূর পরাহত।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসহ ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন

ত্রয়োদশ সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য হল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান। এটি ১৯৯৬ সালের ১ নম্বর আইন। সংশোধনীটি ২৬৮-০ ভোটে পাশ হয়। বিতর্কিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে, ২৬ মার্চ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল এনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিল পাশ করা হয় যা ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। (জালাল ফিরোজ, ১৯৯৮)

বিষয়বস্তু

এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৪র্থ ভাগে "২ক পরিচ্ছেদ ঃ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার" নামক একটি নতুন পরিচ্ছেদ যোগ করা হয় এবং ৫৮ক, ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ ও ৫৮ঙ নামক নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করা হয়। তাছাড়া সংবিধানের ৬১, ৯৯, ১২৩, ১৫৭, ১৫২ নং অনুচ্ছেদসহ ৩য় তফসিলের বিধানের সংশোধন করা হয়। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৬ ঃ ৩৯)

কার্যত ঃ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ঐ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা পালন করবেন। প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন শুধুমাত্র সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। ঐ মেয়াদে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন

৫৮গ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১১ সদস্যের বেশী হবে না। এর মধ্যে একজন প্রধান উপদেষ্টা এবং অনধিক ১০জন উপদেষ্টা থাকবে। প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়োগ দান করবেন রাষ্ট্রপতি তিনি প্রধান উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করে অন্যান্য উপদেষ্টাদের নিয়োগ দান করবেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদমর্যাদা ও কার্যাবলী

ক. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রজাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাহায্য ও সহায়তায় সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পদন করবেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ব্যতীত এ সরকার কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না।

খ. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে যথাযথ সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রদান করবেন (বাংলাদেশ সংবিধান, ১৯৯৬ ঃ ৪৩)।

বাংলাদেশে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে পর পর দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছে। এ দুটি সরকারের গঠনে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, দুই-ই রয়েছে। মূল সাদৃশ্য রয়েছে এদের নির্দলীয় চরিত্রে। মূল বৈসাদৃশ্য রয়েছে এদের সাংবিধানিক পরিচয়ে, যার উৎস ছিল রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি ও সংসদীয় পদ্ধতির মধ্যকার ভিন্নতায়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ছিল পরিপূর্ণ ঐক্য, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন (জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ১৯৯ ঃ৬)। নিম্নে এ দু' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তুলনামূলক আলোচনা করা হ'ল।

প্রথমতঃ বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আন্দোলনরত বিরোধী দল ও জোটগুলোর ঘোষিত যৌথ ঘোষণার ভিত্তিতে। অপর পক্ষে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় সংসদের গৃহীত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। কর্মরত প্রধান বিচারপতি থেকে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন কর্তৃক প্রথমে উপ-রাষ্ট্রপতি ও পরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করার ফলে সংবিধানের লংঘন করা হয়, তবে সাংবিধানিক বৈধতা প্রদানের জন্য পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংবিধানের একাদশ সংশোধনী উত্থাপন ও পাশ করা হয়। এ সংশোধনটি ১০ আগষ্ট ১৯৯১ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে।

দ্বিতীয়ত ঃ বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের সরকার ছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির, কিন্তু বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সরকার ছিল সংসদীয় পদ্ধতির। প্রথম সরকারের প্রধান ব্যক্তি একই সাথে রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান, তাই কারো কাছে তার জবাবদিহীতার বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় সরকারের প্রধান ব্যক্তি শুধুমাত্র সরকারের প্রধান। তিন তার উপদেষ্টা পরিষদের সব সদস্যসহ যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী ছিলেন।

তৃতীয়ত ঃ প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিরক্ষাসহ রাষ্ট্রের সব নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করেন। ত্রয়োদশ সংশোধনীর আওতায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনীর কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করায় দ্বিতীয় সরকার এ ক্ষমতা ভোগ করতে পারেনি (তারেক শামসুর রহমান (সম্পা.) ঃ ১৪৪)।

চতুর্থত ঃ প্রথম সরকারকে সাংবিধানিকভাবে "নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার"

আখ্যায়িত করা হয়। দ্বিতীয় সরকারকে সংবিধান "নির্দলীয় সরকার" হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

পঞ্চমত ঃ প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন কয়েক দফায় ১৭জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় সরকারের ক্ষেত্রে একজন প্রধান উপদেষ্টা ও অনধিক ১০জন উপদেষ্টার নির্দিষ্ট বিধান রাখা হয়।

ষষ্ঠত ঃ প্রথম সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ, প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বড় কোন প্রশ্ন বা অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়নি। দ্বিতীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় প্রথম অবস্থা থেকেই অভিযোগ উঠতে থাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে। দ্বিতীয় সরকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্ব প্রথম প্রশ্ন তোলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, "তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এমন কেউ কেউ আছে যারা বিগত আন্দোলনের ভিতর ছিলেন না, বরং বি. এন. পিকে টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করেছেন"।

সপ্তমত ঃ দুই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত দুটি সাধারণ নির্বাচনকেই দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষকরা সাধারণভাবে সন্তোষজনক মাত্রায় অবাধ ও সুষ্ঠু হিসেবে মূল্যায়িত করেছেন। তবে পরিসংখ্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে বলার সুযোগ থাকে যে দ্বিতীয় সরকারের আমলে নির্বাচনে বেশী সংখ্যক ভোট কেন্দ্রে সংঘর্ষ ও নির্বাচন স্থগিত হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ফলাফলের পর বেশী সংখ্যক আসনের কেন্দ্রের বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং নির্বাচনী মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার অপেক্ষা দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে বেশী অভিযোগ উঠেছে। অথচ দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে। এসব সন্দেহ ও অভিযোগের কারণ বিশ্লেষন করলে দেখা যায়–১৯৯০ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে, কিন্তু দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় বিএনপি সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে। আবার দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস করে বি এন পি সরকার। ফলে এ সরকারের সদস্যদের ব্যাপারে আওয়ামীলীগ প্রথমে অভিযোগ তোলে এবং নির্বাচনের ফলাফলের

পরিপ্রেক্ষিতে বি এন পি কারচুপির অভিযোগ আনে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার অভাবই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকারিতা ঃ

সরকার একটা বিমূর্ত সংস্থা, যার মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়। সরকারের বৈধতা ও দক্ষতা নির্ভর করে সে দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর। রাষ্ট্র বিজ্ঞানী Rodenbaum তার 'Political culture' গ্রন্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে 'Integrated political culture' এবং Fragmanted political culture' এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে Low political culture বা Fragmanted political culture হিসেবে ধরা যেতে পারে। এ সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সমূহ হ'লঃ-

প্রথমতঃ সংকীর্ণ রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রাধান্য; **দ্বিতীয়তঃ** জাতীয় বিরোধ, সাংবিধানিক সমস্যা, জাতীয় সদস্যার জন্য ব্যাপকভাবে গৃহীত ও প্রচলিত সুষ্ঠু সিভির নিয়মাবলী বা সমঝোতার অভাব। **তৃতীয়তঃ** মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ এবং বিপক্ষের মতদ্বৈততা বিধায় সমাজ দ্বিধাবিভিক্ত; **চতুর্থতঃ** রাজনৈতিক আদর্শের অভাব; **পঞ্চমতঃ** সুষ্ঠু ও সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব; **ষষ্ঠতঃ** পরম সহিষ্ণুতার অভাব ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনীহা (দৈনিক ইনকিলাব ঃ ১৯৯৭)

রাজনীতিতে এসব উপাদান বিদ্যমান থাকায় গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম প্রধান শর্ত হিসাবে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি নির্বাচনকে ঘিরেই রয়েছে সন্দেহ, অবিশ্বাস আর অভিযোগ। এসব অবস্থার প্রেক্ষিতেই সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী ওঠে এবং দীর্ঘ আন্দোলনের পর বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৯৬ সালে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পর পর দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলী আলোচনা করে দেখা যায় যে, এ সরকারদ্বয় বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কে ব্যাপক আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে পারলেও

দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন ঘিরে নানা অভিযোগ রয়েছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বাংলাদেশের নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে হলে শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনই যথেষ্ট নয়। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবেঃ

প্রথমতঃ নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে। কমিশনের স্থায়ী অফিসার থাকতে হবে **দ্বিতীয়তঃ** নির্বাচন কমিশনের প্রধানকে খুবই স্বাধীনচেতা ও বিচক্ষণ হতে হবে **তৃতীয়তঃ** নতুন ও সঠিক ভোটার তালিকা তৈরী করতে হবে। **চতুর্থতঃ** ভোটার আইডি কার্ড প্রচলন করতে হবে **পঞ্চমতঃ** সরকারী অফিসারদের পিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার থেকে বাদ দিতে হবে। কারণ তারা অনেক ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে **ষষ্ঠতঃ** দেশের বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদ করতে হবেএবং এর প্রশাসনের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে **সপ্তমতঃ** নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী বিভাগ থেকে মুক্ত করে শক্তিশালী করতে হবে **অষ্টমতঃ** ভোটাধিকার, ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে **নবমতঃ** রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী আচরণ বিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে বাধ্য করতে হবে এবং **শেষতঃ** তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি স্তরে দক্ষতা, মিতব্যয়ীতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে (এম এ ওয়াজেদ মিয়া ঃ ১৯৯৭)।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে উক্ত কার্য পদ্ধতিগুলো পালন করতে হবে। আর এগুলো কার্যকরী করতে পারলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধু তত্ত্বে নয়, বাস্তবরূপ লাভ করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে– Al Musud Hasanuzzaman তাঁর 'The Role of Opposition in Bangladesh politics" গ্রন্থে বলেছেন, "Though formalizing the care-taker government of Bangladesh has founded an unique example in parliamentary frame work. Constitutional measure of this sort can be followed by similar other developing countries where political culture of trust, democratic norms, values and conventions are yet to take firm roots."

(Al-Masud Hasanuzzaman, 1998 : 193)

উপসংহারঃ

বাংলাদেশে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তা এ যাবৎ বিশ্বের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার যাবতীয় উন্নয়নের (নির্বাচনকালীন অন্তবর্তী সরকার প্রশ্নে) মিলিতরূপ। সে দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশের 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার'ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ও সংযোজন হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়। গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন একটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতির সুদৃঢ় বুনিয়াদ, আর এ সংস্কৃতি নির্মান একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এ পথ নির্মানে শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার এককভাবে কোন সফলতা আনতে পারে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ যাত্রাপথের একটি শুভ সূচনা করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের দুটি সাধারণ নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। এতে আশা করা যায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। অবশ্য এজন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আইনগুলো সংশোধন করে জটিলতা মুক্ত করতে হবে, নির্বাচন কমিশনকে এর কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ স্বায়ত্ত শাসিত করতে হবে এবং নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে স্বল্প সময়ে মামলা নিস্পত্তির বিধান করতে হবে। এগুলো নিশ্চিত করা গেলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

খান, মিজানুর রহমান (১৯৯৫), *সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক।* ঢাকা ঃ সিটি প্রকাশনী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৬), *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত)। ঢাকা ঃ গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস।

নাথ, বিপুল রঞ্জন, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিকাশ।* ঢাকা ঃ বুক সোসাইটি।

ফিরোজ, জালাল (১৯৯৮), *পার্লামেন্টারি শব্দকোষ।* ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী।

ভূঁইয়া, ডঃ মোঃ আব্দুল ওদুদ (২০০০), *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন।* ঢাকা ঃ আজিজিয়া বুক ডিপো।

মিয়া, এম. এ. ওয়াজেদ, *বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান।* ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী।

রহমান, তারেক শামসুর (সম্পা.), *বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর।* ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স।

সিদ্দিকী, জিল্লুর রহমান (১৯৯১), ***যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ছিলাম।*** ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী।

হক, মোঃ মোজাম্মেল (১৯৯৭), *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি।* ঢাকা।

হালিম, মোঃ আব্দুল, সংবিধান, ***সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি*** *ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ।*

দৈনিক আজকের কাগজ (৫-৬/৬/১৯৯৪)

দৈনিক ভোরের কাগজ (১/৩/১৯৯৬)

দৈনিক সংগ্রাম (৩০/৩/১৯৯৬)

Brohi, A. K. (1958), ***Fundamental Law of Pakistan,*** Dhaka.

Bhuyan, Sayefullah & Goswami, Arun Kumar (1998), **"The June 1996 parliamentary Election in Bangladesh** : A Review" *A Journal of Faculty of Social science University of Dhaka (SSR),* Vol. XV, No. 2 : 22.

Hasanuzzaman, Al Masud (1998), ***Role of Opposition in Bangladesh politics,*** Dhaka : UPL